গ্যাস-তেল-কয়লা বিষয়ক নাগরিক কমিশন
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

মতবিনিময় সভা

জাতীয় প্রেস ক্লাব, ৮ আগস্ট ২০০৭

উপস্থাপিত লিখিত বক্তব্য

বিষয়: জনস্বার্থ ও সর্বশেষ (জুন ২০০৭) খসড়া কয়লানীতি

bup2@citech-bd.com

নাগরিক কমিশন

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ	আহ্বায়ক
ড. আবুল বারকাত	সদস্য সচিব
বিচারপতি গোলাম রাব্বানী	সদস্য
সৈয়দ ইউসুফ হোসেন	সদস্য
ড. এস কে আবদুল্লাহ	সদস্য
জনাব নুরুদ্দিন মাহমুদ কামাল	সদস্য
জনাব রফিদুল ইসলাম	সদস্য
অধ্যাপক সৈয়দ আবদুল হাই	সদস্য
জনাব গোলাম মোর্তোজা	সদস্য

ভূমিকা

টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য অব্যাহত জ্বালানি-নিরাপত্তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। জ্বালানি নানা ধরনের রয়েছে, রয়েছে এর নানা ব্যবহার ও ব্যবহারকারী গোষ্ঠী।

সকল উৎস, সকল ব্যবহার, এবং সকল গোষ্ঠীকে বিবেচনায় নিয়ে জ্বালানির সরবরাহ ও চাহিদা নির্ধারণ করা অব্যাহত জ্বালানি-নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রণীত সমন্বিত জ্বালানিনীতির মৌলিক উপজীব্য। বাংলাদেশের মত একটি স্বল্প উন্নত দেশে বিরাজমান জ্বালানি কাঠামোয় বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহার করতে পায় জনগণের ক্ষুদ্র একটি অংশ; বড় অংশ ব্যবহার করে জৈবজ্বালানি; এবং মাথাপিছু মোট জ্বালানিও ব্যবহৃত হয় স্বল্পমাত্রায়। যেমন বাংলাদেশে মাত্র ৩০-৩২ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পায় (তাও অনেক ক্ষেত্রে অনিয়মিত এবং নিম্নমানের), মোট ব্যবহৃত জ্বালানির ৬৫ শতাংশ জৈব-জ্বালানি, এবং মাথাপিছু মোট জ্বালানি-ব্যবহার বছরে মাত্র ১৫৩ তেলসম কিলোগ্রাম (KgOE) যা বিশ্বে সবচেয়ে কম মাত্রার ব্যবহারের অন্যতম। উদাহরণস্বরূপ, নেপালে তা ৩৫৭, মালয়েশিয়ায় ২,১৬৮, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৭,৬৯৯ (২০০১ সালের হিসাব অনুযায়ী)।

একটি কার্যকর জ্বালানিনীতি এমন হবে যাতে বাণিজ্যিক জ্বালানির ব্যবহার উত্তরোত্তর উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ে এবং বেশি বেশি মানুষ বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহার করতে পায়। এছাড়াও, পিছিয়েপড়া মানুষের কাছেও যেন উল্লেখযোগ্য হারে বাণিজ্যিক জ্বালানি পৌঁছে তার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

এরকম একটি সমন্বিত জ্বালানিনীতির আঙ্গিকেই বিভিন্ন ধরনের জ্বালানির উন্নয়ন ও ব্যবহার বিবেচনা করতে হবে, অব্যাহত জ্বালানি-নিরাপত্তা নিশ্চিত করার স্বার্থে।

বাংলাদেশের জাতীয় জ্বালানিনীতি

১৯৯৫ সালে অনুমোদিত বাংলাদেশের জাতীয় জ্বালানিনীতির প্রধান ৭টি উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ - (১) উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সকল খাতের টেকসই অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনের জন্য অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা; (২) জ্বালানি অবকাঠামো নির্মাণ করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল এবং আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠীর জ্বালানি চাহিদা মিটাবার ব্যবস্থা করা; (৩) দেশের সকল ধরনের জ্বালানিসম্পদের সর্বোত্তম উন্নয়ন ও ব্যবহার নিশ্চিত করা; (৪) জ্বালানি ইউটিলিটিগুলোর টেকসই পরিচালনা নিশ্চিত করা; (৫) জ্বালানি সম্পদের যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করা; (৬) জ্বালানি উন্নয়নের সময় পরিবেশগত বিষয় যথাযথভাবে বিবেচনা করা এবং পরিবেশের ক্ষতিসাধন ন্যূনতম পর্যায়ে রেখে জ্বালানি উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা; (৭) জ্বালানি খাতের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় সরকারি ও বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদান করা। ২০০৪ সালে প্রণীত খসড়া জ্বালানিনীতিতে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত তিনটি উদ্দেশ্য সংযোজন করা হয়েছে - (৮) ২০২০ সালের মধ্যে সকলের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করণ; (৯) জ্বালানির

(তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ) যুক্তিসঙ্গত মূল্য নির্ধারণ করা; (১০) আঞ্চলিক জ্বালানি বাজার পর্যালোচনা করা। ২০০৪ সালে প্রস্তাবিত জাতীয় জ্বালানিনীতিতে উপরোক্ত মোট দশটি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

এই প্রতিবেদনের ভূমিকায় আলোচনার প্রেক্ষিতে জাতীয় জ্বালানিনীতি আরো বাস্তবভিত্তিক ও উপযোগী করা সম্ভব এবং প্রয়োজন। তাছাড়া এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা জরুরি যা এযাবৎ করা হয়নি। তবে এই প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত কয়লানীতিতে জাতীয় জ্বালানিনীতির প্রতিফলন ঘটেছে কি না সে বিষয়েই শুধু মন্তব্য করা হবে।

প্রস্তাবিত কয়লা নীতি: জুন ২০০৭ সংস্করণ

২০০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম খসড়া কয়লানীতি প্রণয়নের পর কয়েক মাস পরপর একটি করে মোট এযাবৎ ৭টি খসড়া প্রণীত হয়েছে। ৭ম এবং এখন পর্যন্ত সর্বশেষ খসড়া জুন ২০০৭-এ তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে এটি অধ্যাপক আব্দুল মতিন পাটওয়ারীর নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটি বিচার বিশ্লেষণ করছে।

আগের খসড়াগুলো তুলনায় জুন ২০০৭-এর পূর্ণকলেবরের খসড়ায় জনস্বার্থের পক্ষে গুণগত মানের কিছু পরিবর্তন লক্ষণীয়। এই খসড়ার গ্রহণযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য নয় এমন কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের উপর এই প্রতিবেদনে আলোকপাত করে কমিশনের মতামত তুলে ধরা হলো।

প্রস্তাবিত কয়লানীতি ও জাতীয় জ্বালানিনীতি

জাতীয় জ্বালানিনীতির সঙ্গে সর্বশেষ খসড়া কয়লানীতিরও সমন্বয়ের বিষয়টি সরাসরি উত্থাপন করা হয়নি। অথচ জাতীয় জ্বালানি-নিরাপত্তার স্বার্থে জ্বালানির সকল উৎস একটি সার্বিক আঙ্গিকে বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয়।

তবে দেখা যাচ্ছে, কয়লানীতির সর্বশেষে খসড়া (পরবর্তীতে ‘খসড়া কয়লানীতি’ বলে একে আখ্যায়িত করা হবে) প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রাপ্যতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে কয়লার ব্যবহার প্রাক্কলন করা হয়েছে (ভূমিকা; অনুচ্ছেদ ২.২)। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ও আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠীর জ্বালানি চাহিদা মেটাবার লক্ষ্যে খসড়া কয়লানীতিতে “... দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কয়লাভিত্তিক ক্ষুদ্রাকার বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে উৎসাহ প্রদান করা হবে” বলে প্রস্তাব রাখা হয়েছে (অনুচ্ছেদ ৩.৪.২)।

জাতীয় জ্বালানিনীতিকে কার্যকরভাবে বিবেচনায় না রাখার কারণে দেখা যাচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপাদন ছাড়া অন্যান্য ব্যবহারের জন্য কয়লার কোনো হিসেব বা প্রাক্কলন দেখানো হয় নি। অথচ গ্যাসের প্রাপ্যতা ২০১১ সালের পর ক্রমান্বয়ে কমে যাবে বলে খসড়া কয়লানীতিতেও স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এর মানে এই

যে, শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নয়, রান্নাবান্নাসহ অন্যান্য কাজের জন্যও গ্যাসের প্রাপ্যতা কমে যাবে। তাই কয়লা ব্যবহারের প্রাক্কলনে সেদিকেও নজর দেয়া প্রয়োজন।

এক্ষেত্রে কমিশনের প্রস্তাব হচ্ছে কয়লানীতির শুরুতেই কিভাবে এই নীতি জাতীয় জ্বালানিনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতে হবে।

কয়লা উত্তোলন

এক্ষেত্রে তিনটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ: উত্তোলনযোগ্য কয়লার পরিমাণ, কয়লা উত্তোলন পদ্ধতি, এবং কয়লা উত্তোলন ব্যবস্থাপনা।

- উত্তোলনযোগ্য কয়লার পরিমাণ

খসড়া কয়লানীতিতে বর্তমানে প্রমাণিত মোট কয়লা মজুদ ১,১৬৮ মিলিয়ন টন দেখানো হয়েছে। পূর্ববর্তী সংস্করণে এর পরিমাণ দেখানো হয়েছিল ১,৪৬০ মিলিয়ন টন এবং তার আগে এর পরিমাণ বলা হয়েছিল ২,৭০০ মিলিয়ন টন। এর কোনো ব্যাখ্যা খসড়া কয়লানীতিতে নেই। কয়লার পরিমাণ নিয়ে এভাবে সংখ্যার খেলা গ্রহণযোগ্য নয়। **কাজেই বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ বর্তমানে উত্তোলনযোগ্য কয়লার পরিমাণ কত তা পরিষ্কারভাবে কয়লানীতিতে থাকতে হবে।** পরে আরো কয়লা আবিস্কৃত হলে তা হিসাবে আসবে।

- কয়লা উত্তোলন পদ্ধতি

যদিও কয়লা উত্তোলনের প্রাক্কলন সুড়ঙ্গপদ্ধতি ও উন্মুক্তপদ্ধতি উভয়ভাবে দেখানো হয়েছে (অনুচ্ছেদ ২.২ ক ও খ), উন্মুক্তপদ্ধতির দিকে পক্ষপাতিত্ব বিভিন্ন বক্তব্যে পরিস্ফুট হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের বাস্তবতায় উন্মুক্তপদ্ধতি গ্রহণযোগ্য নয়। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ নাজুক এবং তার সাথে যুক্ত হতে যাচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নানা বিরূপ প্রভাব। এমনিতেই ভূমির অন্যান্য ব্যবহারের জন্য কৃষি জমি কমে যাচ্ছে; তা ছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আগামী কয়েক দশকের মধ্যে উপকূলীয় অনেক এলাকা ও দেশের ভেতরে অনেক নিম্নাঞ্চল কৃষি তথা কোনো কাজের জন্য ব্যবহারযোগ্য থাকবে না। বন্যার প্রকোপ বাড়বে বলে আশংকা রয়েছে। এমতাবস্থায় উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের ফলে স্থানীয় এলাকাগুলোর পরিবেশে আরেকটি বিধ্বংসী পদক্ষেপ সংযোজিত হবে। আর অত্যন্ত ঘনবসতির এই দেশে যে হাজার হাজার মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে যাবে তাদের যথাযথ পুর্নবাসন দেশে বিরাজমান স্থানসংকট এবং অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত বাস্তবতায় সম্ভব নয়। কেবল ফুলবাড়ির ক্ষেত্রেই উন্মুক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করা হলে ৪০,০০০

থেকে ৫০,০০০ মানুষের পুনর্বাসনের প্রয়োজন হবে। জার্মানিতে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে যেখানে কয়লা উত্তোলন করা হয় সেখানে বসতি এত কম যে, স্বল্পসংখ্যক মানুষকে পুনর্বাসন করার প্রয়োজন হয়েছে। ১৯৫০-এর দশক থেকে এযাবৎ মাত্র ৫০,০০০ মানুষের পুনর্বাসনের প্রয়োজন হয়েছে এবং সে দেশে আর্থ-সামাজিক, প্রযুক্তিগত এবং পরিবেশগত সুবিধা রয়েছে প্রচুর পরিমাণে।

কাজেই কমিশনের প্রস্তাব হচ্ছে বাংলাদেশের বাস্তবতার আলোকে উন্মুক্ত পদ্ধতির কয়লা উত্তোলনের ধারণা পরিহার করতে হবে।

- কয়লা উত্তোলন ব্যবস্থাপনা

রয়্যালটির বিনিময়ে বেসরকারি কোম্পানিকে কয়লাখনি ইজারা দেয়ার প্রস্তাব খসড়া কয়লানীতিতে রাখা হয়েছে। অবশ্য রয়্যালটি পূর্বের প্রস্তাবিত ৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ন্যূনতম ২০ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে (অনুচ্ছেদ ১০.২.১)। রয়্যালটি নির্ধারণে একটি ফর্মুলা প্রস্তাব করা হয়েছে। বিভিন্ন উপাত্তের মানের ভিত্তিতে ফর্মুলা অনুযায়ী রয়্যালটি ২০ শতাংশের বেশিও হতে পারে।

তবে রয়্যালটি বাড়ানোর প্রস্তাব উল্লেখযোগ্য হলেও, রয়্যালটি-ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হলে কয়লা উত্তোলন এবং এর মূল্য নির্ধারণ ও রপ্তানি ইজারাদার কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদেশী বিভিন্ন কোম্পানি ইজারাদারী দায়িত্ব পাবে। ফলে দেশী-বিদেশী কোম্পানি, বিশেষ করে বহুজাতিক বিদেশী কোম্পানি বাংলাদেশে কয়লা-ব্যবস্থাপনায় মূখ্য ভূমিকায় চলে আসবে। অথচ মিয়ানমার, ভারত, থাইল্যাণ্ড, চীন ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রসহ বিশ্বের অনেক দেশ তাদের নিজস্ব খনিজ সম্পদের নিয়ন্ত্রণ সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে করে থাকে।

কমিশনের মূল্যায়নে বাংলাদেশের জনগণ তাদের সম্পদ কয়লার উপর জাতীয় নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিতে রাজি নয় কেননা এই ছাড় দেওয়া হবে জনস্বার্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাই কমিশনের জোরালো সুপারিশ সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণেই কয়লা উত্তোলনের ব্যবস্থা করা হউক।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লার প্রস্তাবিত ব্যবহার

গড়ে বছরে ৮ শতাংশ হারে জিডিপি বৃদ্ধি পেলে ২০২৫ সালে বিদ্যুতের মোট চাহিদা হবে ৪১,৮৯৯ মেগাওয়াট। গ্যাস প্রাপ্তি ২০১১ সালের পর ক্রমান্বয়ে কমে যাবার প্রেক্ষিতে বিদ্যুতের এই চাহিদার মধ্যে ৩২,৮৩৭ মেগাওয়াট কয়লার দ্বারা উৎপাদন করা হবে বলে খসড়া কয়লানীতিতে প্রস্তাব করা হয়েছে (অনুচ্ছেদ ২.২)। আরো বলা হয়েছে যে, ২০০৫ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত সময়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনে মোট ৪৫০ মিলিয়ন টন কয়লার প্রয়োজন হবে এবং তারপর প্রতি বছর ৭৫ মিলিয়ন টন হিসেবে কয়লা ব্যবহৃত

হবে বলে ধরা হয়েছে। এসকল হিসাব-নিকাশ থেকে দেখানো হয়েছে যে, বিদ্যুৎ উৎপাদন ২০৩০ সাল পর্যন্ত মোট কয়লার প্রয়োজন হবে ৮২৫ মিলিয়ন টন এর ২০৩৫ সাল পর্যন্ত তা হবে ১২০০ মিলিয়ন টন।

সকল খনিতে উন্মুক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করলে কয়লার মোট উত্তোলন ১০50 মিলিয়ন টন হতে পারে (২.২ক)। আর সুড়ঙ্গ পদ্ধতিতে মোট ২৩৫ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলন করা সম্ভব হবে।

খসড়া কয়লানীতির প্রাক্কলন অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে, উন্মুক্ত পদ্ধতিতে উৎপাদিত কয়লা ২০৩৩ সাল নাগাদ শেষ হয়ে যাবে (যদি সমস্ত কয়লা বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়)। অপরদিকে সুড়ঙ্গ পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন করা হলে এবং সমস্ত কয়লা বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করা হলে ২০২২ সালেই উৎপাদিত সমস্ত কয়লা নিঃশেষ হয়ে যাবে।

কমিশনের মূল্যায়নে যেহেতু উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন দেশ ও জনস্বার্থ বিরোধী, তাই কমিশনের বিবেচনায় এ যাবৎ আবিস্কৃত কয়লা থেকে সুড়ঙ্গ পদ্ধতির মাধ্যমে মোট ২৩৫ মিলিয়ন টন বা তা থেকে কিছু বেশি কয়লা পাওয়া যেতে পারে যা কেবল বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করলেই ২০২২-২৩ সাল নাগাদ নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর কয়লার অন্যান্য ব্যবহার বিবেচনায় নিলে তার আগেই নিঃশেষ হয়ে যাবে।

এছাড়া কত দ্রুত কয়লা উত্তোলন বাড়ানো যাবে তাও কয়লানীতিতে বিবেচনায় আনতে হবে। এযাবৎ অভিজ্ঞতা এই যে, কয়লা উত্তোলন ত্বরান্বিত করা সহজ নয়। **এই বিবেচনায়ও অব্যাহত জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কয়লানীতি সমন্বিত জ্বালানিনীতির আঙ্গিকে বিন্যস্ত হওয়া জরুরি।**

কয়লা রপ্তানি

কেবলমাত্র বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লা ব্যবহারের প্রাক্কলনের ভিত্তিতে খসড়া কয়লা নীতিতে বলা হয়েছে যে, '... কয়লার অন্য কোনো ব্যবহার বা রপ্তানির কোনো সুযোগ থাকবে বলে প্রতীয়মান হয় না' (অনুচ্ছেদ ২.২ খ)। একই বক্তব্য ৩.৫ অনুচ্ছেদেও রাখা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ৩-৫-এ এও বলা হয়েছে যে, কয়লা ও গ্যাস ক্ষেত্রে নতুন আবিষ্কার ঘটলে ৫০ বছরের জ্বালানি নিশ্চিত হবার পর যদি অতিরিক্ত কয়লা থাকে তা যথাযথ অনুমোদন সাপেক্ষে রপ্তানির সুযোগ দেয়া যেতে পারে।

এসকল বক্তব্য থেকে এটি পরিষ্কার যে, বর্তমান বাস্তবতায় কয়লা রপ্তানির কোনো সুযোগ নেই। মোদ্দা কথা, বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে কয়লা রপ্তানির চিন্তাই দেশের অর্থনীতি এবং জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী।

কিন্তু খসড়া কয়লানীতিতে বিভিন্ন স্থানে কয়লা রপ্তানি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় ও রপ্তানিযোগ্য কয়লার মূল্য কি হবে সে সম্বন্ধে বক্তব্য রাখা হয়েছে। যেমন আন্তর্জাতিক কয়লামূল্যের ত্রৈ-মাসিক গড় অনুসারে কয়লার

মূল্য মার্কিন ডলারে নির্ধারণ করে তা ওয়েবসাইটে ও সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে (অনুচ্ছেদ ১০.১)। এছাড়াও রয়্যালটি নির্ধারণী-ফর্মুলা প্রস্তাবের ক্ষেত্রেও প্রথমেই রপ্তানি কয়লার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে (অনুচ্ছেদ ১০.২.১)।

যেখানে কয়লা রপ্তানির কোনো সুযোগই নেই সেখানে কয়লা রপ্তানি সংক্রান্ত এ সকল বক্তব্য অপ্রয়োজনীয়, এমনকি অবান্তরও। কমিশনের প্রস্তাব হচ্ছে, কয়লা রপ্তানি সংক্রান্ত সকল বক্তব্য কয়লানীতি থেকে বাদ দিতে হবে।

যদি কখনও আরো অনেক কয়লা আবিস্কৃত হয় আর যথাযথভাবে নির্ধারিত পঞ্চাশ বছরের চাহিদা মেটানোর পর উদ্বৃত্ত থাকে তখন কয়লা রপ্তানিনীতি নির্ধারণ ও গ্রহণ করা হবে বলে বড়জোর একটি বাক্য কোথাও রাখা যেতে পারে।

এশিয়া এনার্জি-র সঙ্গে চুক্তি - ফুলবাড়ি কয়লা খনি

এশিয়া এনার্জি-র সঙ্গে ফুলবাড়ি কয়লা খনি সংক্রান্ত যখন চুক্তি করা হয়েছিল তখন দেশে কোনো কয়লানীতি ছিল না। তদুপরি চুক্তি করা হয় দেশের মানুষের, প্রজাতন্ত্রের মালিকদের আগোচরে। দেখা গেছে, এই চুক্তি এ দেশের অর্থনীতির এবং এদেশের মানুষের বিশেষ করে ফুলবাড়ি এলাকার মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী। তাই এই চুক্তি বাতিলের দাবি রাখে। তদুপরি সরকারের বিশেষজ্ঞ কমিটি প্রস্তাবিত উন্মুক্ত কয়লা উত্তোলন পদ্ধতি বাংলাদেশের বাস্তবতায় গ্রহণযোগ্য নয় বলে মত দিয়েছে।

উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন এবং নিজেরাই মূল্য নির্ধারণ করে উত্তোলিত ১৫ মিলিয়ন টনের মধ্যে ১২ মিলিয়ন টন রপ্তানি করার এশিয়া এনার্জি-র প্রস্তাব ও তৎপরতার বিরুদ্ধে ফুলবাড়ি এলাকার মানুষও রক্তাক্ত রায় দিয়েছে। তদানিন্তন জোট সরকার তা মেনে নিয়ে এশিয়া এনার্জি-র সঙ্গে চুক্তি বাতিল করা হবে বলে জনগণের সঙ্গে চুক্তি করেছিল। যদিও ঐ সরকার সেই লক্ষ্যে কোনো পদক্ষেপ নেয় নি।

জনস্বার্থ বিরোধী এই প্রক্রিয়ায় কয়লা উত্তোলনসহ এশিয়া এনার্জি-র সঙ্গে চুক্তি বহাল রাখার পক্ষে দেশী-বিদেশী বিভন্ন স্বার্থান্বেষী মহল বর্তমান সরকারকে উৎসাহ প্রদান এমনকি এই সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার প্রয়াস পাচ্ছে বলে জানা যায়। **জনস্বার্থের প্রতিকূল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ জনস্বার্থ বিরোধী এই পথে অগ্রসর না হওয়ার জন্য বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি কমিশন জোরালো আহ্বান জানাচ্ছে। পরবর্তী সরকারদের প্রতি একই আহ্বান এখনই উচ্চারণ করা হল।**

------- ✱ -------